মহাকবি কালিদাস এবং বাংলা সাহিত্য

চিন্ময় হাওলাদার*

সারসংক্ষেপ

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে বাংলা সাহিত্যের উপর অনিবার্যভাবে তার প্রভাব পড়েছে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য কিংবা ফার্সি-হিন্দি সাহিত্যের চেয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী তা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মনীষীগণের গবেষণার দ্বারা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংস্কৃত মহাকাব্য, কাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক, গল্পসাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয় বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতিসহ অনেক কিছুকেই আজও প্রভাবিত করে চলেছে। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের মধ্যে কবি নাট্যকার কালিদাসের উপস্থিতি বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যাতিক্রম নয়। বৈষ্ণব পদাবলি থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবি-লেখকগণ কিভাবে কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ব্যাপক এবং সুগভীর। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে ও প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ ও সমৃদ্ধি তার সঙ্গে তুলনা করলে সংস্কৃত সাহিত্যের অবদান মোটেও উপেক্ষণীয় নয়। উনিশ শতকের নবজাগরণের যুগে ইংরেজির পাশাপাশি তাই ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার গতি নতুনভাবে বেগবান হয়ে উঠতে দেখা যায়। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগের কারণে সেসময়ে বাংলা ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে সংস্কৃত মহাকাব্য, কাব্য, নাটকসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আরো অনেক আলোচিত গ্রন্থ। এসময়ে সংস্কৃত নাট্যকার, কবিদের মধ্যে বঙ্গে কালিদাস চর্চা এককভাবে প্রাধান্য লাভ করে।

মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে নানা মত রয়েছে। তাঁর জন্মস্থান, সময়, পারিবারিক পরিচিতি ও রচনাবলি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। তবে মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্– এই তিনটি নাটক, রঘুবংশম্ ও

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

কুমারসম্ভবম্– এই দুটি মহাকাব্য এবং ঋতুসংহারম্ ও মেঘদূতম্– এই খণ্ডকাব্য দুটি নিয়ে মোট সাতটি গ্রন্থ তাঁর রচনাবলে সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রাচীন ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের মহান কবি কালিদাস – এই পরিচয়ের দ্বারা সব কিছু ছাপিয়ে তিনি পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন।

কালিদাসের আবির্ভাবকাল সাধারণভাবে খ্রিষ্টীয় ৩য় ও ৪র্থ শতকের সময় ধরা হয়ে থাকে। কেউ কেউ এর পূর্বে তাঁর সময়, আবার কেউ কেউ এর পরবর্তীতে তাঁর আবির্ভাবকাল বলে মনে করে থাকেন। তবে তাত্ত্বিকদের মতে, কালিদাসের কাল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বা রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে (৩৫০-৩৭৫খ্রি.)। প্রচলিত ধারণা মতে, তিনি বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময় নিয়েও মতভেদ রয়েছে। এ প্রবন্ধে কালিদাসের জীবনী, জন্মস্থান, কালসম্পর্কিত বিষয়াদি বাদ রেখে তিনি কিভাবে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছেন, এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মহাকবি কালিদাস এবং বাংলা সাহিত্য

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যে নানামাত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। রাজসভার কবি হলেও মানবীয় প্রেম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কালিদাসের সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। মূলত, প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি হিসাবে কালিদাসের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম, বিরহ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে রচিত ঋতুসংহার, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর অনুপম সৃষ্টি হিসেবে যুগ যুগ ধরে সাহিত্য রসিকদের প্রাণের খোরাক যুগিয়ে আসছে।

আষাঢ়ের পটভূমিতে কালিদাসের রচিত মেঘদূত বিরহের কাব্য। বিরহ-প্রেম ও প্রকৃতির বর্ণনাই এ কাব্যে মুখ্য হয়ে উঠেছে। মেঘদূতের মধ্যে কবি যে প্রেম-চেতনা ও সৌন্দর্যবোধের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা পরবর্তী কবি, সাহিত্যিকদের বার বার আকৃষ্ট করেছে। বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০), বড়ু চণ্ডীদাস (১৩৭০-১৪৩০) থেকে গোবিন্দদাস (মৃত্যু-১৬২০), জ্ঞানদাস (জন্ম-১৫৬০), রূপ গোস্বামী (১৪৮৯-১৫৬৪), ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০), ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) প্রমুখ কবিদের লেখা বিচার করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। জ্ঞানদাসের বিরহদগ্ধা রাধা যখন বলেন–

> রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
> প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। (সেন, ২০০৩: ৫৫)

তখন এর সাথে আমরা কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষের উক্তির সাদৃশ্য খুঁজে পাই। মেঘদূতের কামপীড়িত নির্বাসিত যক্ষও বিরহ বেদনায় যেসময়ে কাতর সেসময়ে বলে উঠেন–

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ় তপ্তেন তপ্তং ...। (Kale, 1997: 165)

সুতরাং জ্ঞানদাস যে মেঘদূতের বিরহ-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। জ্ঞানদাসের মতোই ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি ও দার্শনিক রূপ গোস্বামী (১৪৮৯-১৫৬৪), যিনি কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মেঘদূতের অনুকরণে রচনা করছেন 'হংসদূত' ও 'উদ্ধব সন্দেশ' কাব্যদ্বয়।

মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০)। তাঁর কাব্যে যে কল্পলোকের পথে তিনি যাত্রা করেন, সেখানেও দেখি তাঁকে কালিদাসের অনুবর্তী হতে। কালিদাসের রোমান্টিক মানস দুঃখতাড়িত, কুটিল এই পৃথিবীর পরিবর্তে যে কল্পজগতে বাস করে তা অনেকটা পৃথিবীর বাইরে, কৈলাস পর্বতের উপরে অলকা নগরে। অপূর্ব সে অলকা! যেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান, নিত্য জ্যোৎস্না, যৌবন ভিন্ন অন্য কোনো বয়স নেই, অশ্রু কেবল আনন্দেই ঝরে, কেননা প্রণয় কলহ ভিন্ন কোনো দ্বন্দ্ব নেই, 'পাদপা নিত্যপুষ্পা' সেখানে। কালিদাসের এই যে মনোরম কল্পনার জগৎ সৃষ্টি তা লোভনীয় ছিল ভারতচন্দ্রের কাছেও। তাঁর 'বারমাস্যায়' কালিদাসের কল্পিত জগতের ছবি আমরা দেখতে পাই। তাঁর *অন্নদামঙ্গল*, *বিদ্যা-সুন্দরীতে* মেঘদূতের ভাব, ভাষা, ধ্যান-ধারণা, উপমা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

বঙ্গে ইংরেজ শাসনের সূচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের কবি, লেখকদের মধ্যে আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের পরে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে অনেকেই উজ্জীবিত হন এবং একই সঙ্গে অনেক মনীষীও নতুনভাবে ঐতিহ্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে উঠেন। রেনেসাঁ বা নবজাগরণের এ সূচনা পর্বে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয় নতুন নতুন চিন্তা-চেতনার ঢেউ এদেশীয় জনচিত্তকে আলোড়িত করে তোলে। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭), বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) মতো সৃষ্টিশীল মনীষীগণের আর্বিভাব এসময়ে ঘটে। তাঁদের হাতেই বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিক, ভাব, ভাবনা, ভাষা, ছন্দ, স্বাদেশিক আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নানামাত্রিক পরিবর্তন ঘটতে দেখতে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন ১৮৫৪ সালে। তাঁর হাতেই বাংলা গদ্যের মুক্তি

ঘটেছিল। তিনি বাংলা বানান রীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা ভাষাকে যুগোপযোগী করে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬০ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেন মেঘদূত (১৮৬০) এবং তাঁর জ্যোতি দাদা (ঠাকুর, ১৮৪৯-১৯২৫) কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্- তিনটি নাটকই বাংলায় অনুবাদ করেন।

কুমারসম্ভবের প্রথম পদ্যানুবাদ করেন হরিমোহন কর্মকার এবং পরে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) এর অনুবাদ করেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কালিদাসের ঋতুসংহার ও মেঘদূত কাব্য দুটিও বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এভাবে ঊনিশ শতকে সংস্কৃত কবিদের মধ্যে কালিদাস এককভাবে বৃহৎবঙ্গে সমাদৃত হয়ে উঠেন এবং এর ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাব স্থায়ীরূপ লাভ করে।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষকালের কবি। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি কবি হিসেবে তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর কবিতার ইতিহাসমূল্য অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে আধুনিক কবি হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও তিনি তাঁর কবিতায় খাঁটি বাঙালির চিত্তলোক উদ্ভাসিত বলে মান্য করেছেন। আমরা ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে কালিদাসের নানামাত্রিক প্রভাব দেখতে পাই। তাঁর প্রেম, প্রকৃতি ও ঋতুরঙ্গ, অভিজ্ঞানশকুন্তল, সারদা-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে তিনি কালিদাসের নানা উপাদান ব্যবহার করেছেন। কালিদাসের মতো ষড়ঋতু বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখেছেন। এছাড়া *অভিজ্ঞানশকুন্তল* ও *সারদা-মঙ্গল* কাব্য দুটিতে কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তল* ও *কুমারসম্ভবের* প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক বাংলা কাব্যজগতে বিহারীলাল চক্রবর্তীকে (১৮৩৫-১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিহিত করছেন 'ভোরের পাখি' বলে। তাঁর সাহিত্য পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, তিনি কালিদাসের প্রেম-চেতনা ও প্রকৃতিরূপ বর্ণনার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন; *বন্ধুবিয়োগ*, *বঙ্গসুন্দরী*, *নিসর্গ সন্দর্শন*, *প্রেম প্রবাহিনী* প্রভৃতি কাব্যে সহজেই তার স্বাক্ষর মেলে। *'সারদামঙ্গল'* কাব্যের প্রথম সর্গে কবি বিহারীলাল লিখেছেন –

> মাথা থুয়ে পয়োধরে
> কোলে বীণা খেলা করে
> স্বর্গীয় অমিয় স্বরে জানিনে কি কথা বলে! (সিদ্দিকী, ১৯৯৭: ২২০)

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর এই বর্ণনার সঙ্গে আমরা মিল খুঁজে পাই কালিদাসের মেঘদূতের –

উৎসঙ্গে বামলিনবসনে সৌম্য নিক্ষীপ্য বীণাম...। (Kale, 1997: 144)

কিংবা হিমালয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি একই কাব্যের ৪র্থ সর্গে লিখেছেন -

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি কুতূহলে মত্ত করিগণ; (সিদ্দিকী, ১৯৯৭: ২৪৪-২৪৫)

কালিদাসের মেঘদূতের সঙ্গে বিহারীলালের এই বর্ণনার সাদৃশ্য রয়েছে -

বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ পেক্ষণীয়ম দদর্শ ॥ (মেঘদূত, পূর্বমেঘ, শ্লোক ২)

তাঁর 'প্রেম প্রবাহিনী' কাব্যের মধ্যেও আমরা মেঘদূতের প্রতিরূপ বর্ণনা দেখতে পাই। এ কাব্যের ৪র্থ পর্বে কবি বিহারীলাল লিখেছেন :

হিমালয় শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়,
ছড়াছড়ি মণি চুণী রয়েছে যেথায়।...
যথায় যৌবন ভিন্ন নাহিক বয়স,
সুধারস ভিন্ন যাহে নাহি অন্য রস!
প্রণয় কলহ ভিন্ন দ্বন্দ্ব নাই আর,
প্রেম-অশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার। (সিদ্দিকী, ১৯৯৭: ২০০-২০১)

উপরের বর্ণনা সরাসরি কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত কৈলাস শৃঙ্গে অবস্থিত অমরাবতী অলকার কথাই আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। কালিদাস বর্ণনা করেছেন -

আনন্দোত্থং নয়ন সলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈর্নান্যস্তাপঃ
... নচ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥ (*মেঘদূত*, উত্তরমেঘ, শ্লোক ৪)

অতএব কালিদাস তাঁর মেঘদূতের উত্তরপর্বে কৈলাসপর্বতের চূড়ায় অলকাপুরীতে যে প্রেমের, সৌন্দর্যের শাশ্বত অমরাতী রচনা করেছেন, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর মানস যাত্রাও একই দিকে পরিলক্ষিত হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) কাব্য ও নাটকে এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) উপন্যাসে কালিদাসের প্রভাব রয়েছে অপরিসীম। মধুসূদন দত্ত, শ্রীহর্ষ প্রণীত *'রত্নাবলী'* নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। মধুসূদন দত্তের *শর্মিষ্ঠা* এবং *পদ্মাবতী* নাটকে বিশেষত কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তল* নাটকের, *কৃষ্ণকুমারীতে বিক্রমোর্বশী* এবং *মায়াকাননে রঘুবংশের* ও *শকুন্তলার* প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কাব্য

তিলোত্তমাসম্ভব কালিদাসের কুমারসম্ভবের আদর্শে রচিত। এখানে সুন্দ-উপসুন্দের দেবতা নির্যাতন তারকাসুরের মতোই বর্ণিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গের শুরুতে তিনি লিখছেন -

> ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে
> অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন;
> সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল; (গুপ্ত, ২০০৪: ১)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের এমন বর্ণনা আমাদের মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভবের' প্রারম্ভের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় :

> অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
> পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ (*কুমারসম্ভবম্*, প্রথম সর্গ, শ্লোক ১)

দেব-আত্মা, ধবল নামেতে গিরি, হিমাদ্রি– এমন শব্দঝংকারে রচিত
'তিলোত্তমাসম্ভব' মূলত কালিদাসের

কুমারসম্ভবের আদলেই যে এই বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা চলে। তাছাড়া, এ কাব্যে কালিদাসের মহাকাব্য *রঘুবংশের* প্রভাবও সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মধুসূদন দত্ত লিখছেন–

> কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
> আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমনি,
> যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া,
> কে পারে হইতে পার অপার সাগর? (গুপ্ত, ২০০৪: ১০)

এই বর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম সর্গের বর্ণনার চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে :

> ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
> তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ (*রঘুবংশম্*, প্রথম সর্গ, শ্লোক ২)

কালিদাসের কাব্যের, নাটকের এমনতর গভীর প্রভাব মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যান্য নাটক ও কাব্যে পরিলক্ষিত হয়।

মধুসূদন দত্তের *'পদ্মাবতী'* নাটকের প্রথমাঙ্কে রাজা ইন্দ্রনীলকে, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের রাজা দুষ্মন্তের মতোই ধনুর্বাণ হাতে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখা যায়। তাছাড়া, এই নাটকে অপরাপর পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের পাত্র-পাত্রীগণের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

মধুসূদন দত্ত *মেঘনাদবধ* কাব্যে মেঘদূতের ভাব-ভাষা, উপমার ব্যবহার প্রচুর করেছেন। *মেঘদূতে* কালিদাস মেঘের প্রিয়ারূপে বিদ্যুতের উল্লেখ করেছেন। মেঘনাদবধ মহাকাব্যেও মেঘনাদের প্রিয়ারূপে দেখা যায় সৌদামিনীকে। মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ মহাকাব্যে লিখছেন :

> ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
> প্রেমপাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী! (গুপ্ত, ২০০৪: ৫৮)

সুতরাং মধুসূদন দত্ত যে এ ধারণা কালিদাসের মেঘদূত থেকে আত্মস্থ করেছেন তাও সহজেই অনুমান করা যায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথম ইংরেজি সনেটের আদলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে তিনি 'কালিদাস' শিরোনামে একটি কবিতায় লিখছেন -

> কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!
> কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে? (গুপ্ত, ২০০৪: ১৬১)

কালিদাসের শকুন্তলাকে নিয়েও তিনি মনোরম চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছেন -

> কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি!
> তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
> কে না ভালবাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
> প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে? (গুপ্ত, ২০০৪: ১৮০-১৮১)

এছাড়াও মধুসূদন দত্তের চতুর্দশপদী কবিতাবলির মধ্যে রয়েছে -'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'বাল্মীকি', 'কুরুক্ষেত্রে', 'কৃত্তিবাস', 'জয়দেব', 'শিশুপাল', 'মেঘদূত', 'উর্বশী', 'কিরাত-অর্জুনীয়ম্' প্রভৃতি কবিতাগুলি। তাঁর লেখা গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে বলা চলে, মধুসূদনের কবি মনে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে কবি কালিদাস ও তাঁর কাব্যের প্রভাব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও সুগভীর।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রায় সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) কর্তৃক রচিত সবগুলো উপন্যাসই বলা যায় রোমান্সধর্মী। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে অবারিত কল্পনা, বিস্ময়কর ঘটনাবলি, নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলি যা সবই কল্পনাপিয়াসী কবি কালিদাসের সঙ্গে তুল্য। কালিদাসের *বিক্রমোর্বশী*, *ঋতুসংহার*, *কুমারসম্ভব*, *মেঘদূত* প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে আমরা কালিদাসের কল্পনার লীলা-বিলাস দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীতে নারীর যে রূপের বর্ণনা মেলে সেসবের অনেক কিছুই মনে হয় কালিদাস থেকে আহরিত। তাঁর কপালকুণ্ডলা যেন 'চিত্রপটের উপর চিত্র' (চট্টোপাধ্যায়, ২০০১: ৭৯)-এ যেন শকুন্তলার 'চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনার কৃতা নু'

(শ্লোক-৯, দ্বিতীয় অংক,অভিজ্ঞানশকুন্তল) এর প্রতিধ্বনি। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাস যেন কবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের আদর্শে রচিত। এখানে মন্দিরের অধিকারী কপালকুণ্ডলার প্রতি যে গভীর স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা দেখিয়েছেন তার সঙ্গে কেবল কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলায় বর্ণিত আশ্রমের ঋষি কন্বের তুলনা করা চলে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের অধিকারী যেন কন্ব এবং বনদুহিতা কপালকুণ্ডলা যেন শকুন্তলার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাতের যে বর্ণনা পাই, তা পাঠ করলেও কালিদাসের বিরাট প্রভাব অনুমান করা যায়।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বিভিন্ন ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত কাব্যের উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যের উদ্ধৃতি এখানে আমরা দেখতে পাই। এ উপন্যাসের ২.৫ পরিচ্ছেদের শীর্ষে উল্লিখিত রয়েছে মেঘদূতের বিরহী যক্ষের উক্তি:

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ। (বসু, ২০০০: ১২০)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কপালকুন্ডলা উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের শুরুতে 'রঘুবংশের' ষোড়শ সর্গের ৭ম শ্লোকটি উদ্ধার করে লিখছেন –

যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।

বিভর্ষি চাকারমনির্ব্বতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্॥ (১৬। ৭, *রঘুবংশম্*)

একই খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'রত্নাবলী', নবম পরিচ্ছেদে 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' (কন্ব। অলং রুদিতেন; স্থিরাভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়া।) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'কুমারসম্ভব' থেকে আহরিত করেছেন নিম্নের শ্লোকটি –

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে ধৃতংত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে ॥ (৫/৪৪, কুমারসম্ভব)

একই উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'কুমারসম্ভব' (তদগচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্), নবম পরিচ্ছেদে 'রঘুবংশম্' থেকে উদ্ধৃত করে শিরনামে ব্যবহার করেছেন–'বপুষা করণোজ মিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ং।

ননু তৈলনিষেক বিন্দুনাসহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্॥' শ্লোকটি। (চট্টোপাধ্যায়, ২০০১: ১১৫)

বঙ্কিমচন্দ্র *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাপতি, শ্রীহর্ষ, বায়রন (Byron), কিটস্ (Keats), শেক্সপীয়র (Shakespeare) প্রমুখ লেখকের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনাকালে কালিদাসের দ্বারা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে

বলা যায়। তাঁর *বিষবৃক্ষ*, *চন্দ্রশেখর*, *ইন্দিরা*, *দেবীচৌধুরানী* প্রভৃতি গ্রন্থের ভাব-ভাষা, বর্ণনা বিন্যাসে, উপমা প্রয়োগে কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভর,শকুন্তলাসহ অন্যান্য গ্রন্থেরও প্রভাব পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) যাঁর প্রতিভার ছোঁয়ায় আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কেবল সমৃদ্ধ হয়নি, বিশ্ব সাহিত্যের অংশ হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে, তাঁর প্রসঙ্গে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনায়, চিঠিপত্রে, প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে কালিদাসের ব্যাপক উপস্থিতি দেখতে পাই যা আমাদের কাছে অতি বিস্ময়ের বিষয় না হয়ে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কবি মানসে এককভাবে কবি হিসেবে কালিদাস এবং কাব্য হিসেবে মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও রঘুবংশের প্রভাব সবচাইতে বেশি বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। তিনি জীবনের শুরুতে কীভাবে মেঘদূতের সাথে পরিচিত এবং আলোড়িত হয়েছিলেন তা জীবনস্মৃতিতে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন-

> আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন। তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিলো না – তাঁহার আনন্দ আবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। (ঠাকুর, ১৩৯৬: ৪৩৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শৈশবে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। ঠাকুর পরিবারে ধ্রুপদী সংস্কৃত, ফার্সি, হিন্দি, ইংরেজি, বৈদিক সাহিত্যসহ নানা ভাষা ও ধ্রুপদী সাহিত্যের নিয়মিত চর্চা ছিলো। তাঁর পিতা ব্যক্তিগতভাবে উপনিষদ্ এবং সন্ত নানক ও কবি হাফিজের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আধুনিক ইউরোপীয় ইংরেজি সাহিত্যের চর্চাও নিয়মিত ছিল ঠাকুরবাড়িতে। তবে বৈদিক এবং ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিলো।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি নানা তথ্য রয়েছে এ গ্রন্থটিতে। তাঁর এই আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি যে, বঙ্গে একসময় বেদ, উপনিষদের চর্চা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন -

> রামমোহন রায়ের যত্নে তখন কয়েকখানা উপনিষদ্ ছাপা হইয়াছিল; এবং যাহা ছাপা হয় নাই এমন কয়েকখানি উপনিষদ্ আমিও সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু বিস্তৃত বেদের বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না। বঙ্গদেশে বেদের লোপই হইয়া গিয়াছে। (ঠাকুর, ১৯৬২: ৬৬-৬৭)

অতঃপর তিনি বেদ বিশেষভাবে শিক্ষা করিবার জন্য কাশীতে আনন্দচন্দ্র, তারকনাথ, বাণেশ্বর ও রমানাথ নামের ৪ জন ছাত্রকে প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কারণে বঙ্গদেশে বেদ, উপনিষদের চর্চা নবরূপে শুরু হয়েছিল, তা বুঝতে পারা যায়।

পারিবারিকভাবে রবীন্দ্রনাথ শৈশবে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। বাড়ির আবহাওয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় রয়েছে -

> ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিলো যে, বাড়িতে রাত্রিদিন সাহিত্যের হাওয়া বহিত।... সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিলো না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়েই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়ে তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়ে উঠিতেছিল। (ঠাকুর, ১৩৯৬: ৪৫৩-৫৪)

অতি শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে উপনিষদের মন্ত্র শিখেছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখেছেন। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে সংস্কৃত কবিতার সঙ্গে, বিশেষ করে কবি জয়দেব ও কবি কালিদাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি তার বর্ণনাও জীবনস্মৃতিতে দিয়েছেন। (ঠাকুর, ১৩৯৬: ৪৩৮)

বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে কালিদাস নিয়মিতভাবে শিখেছিলেন স্মৃতিকথায় তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। জীবনস্মৃতির 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে তিনি জানিয়েছেন যে, গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে *কুমারসম্ভব*, রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে *অভিজ্ঞানশকুন্তল* পড়েছিলেন। তাছাড়া, সে সময়ের সাহিত্য সাময়িকী *'অবোধবন্ধু'*, *'বঙ্গদর্শন'*, *'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'* প্রভৃতি পর্যাপ্ত পাঠ করার সুযোগ পেয়েছিলেন যা তাঁর শিশু কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃত হতে সহায়তা করেছিল। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শেখানোর জন্য ১৮৯৬ সালে তিনি নিজে *সংস্কৃতশিক্ষা* শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ *'প্রাচীন সাহিত্য'* ও *'বিচিত্র প্রবন্ধ'* শীর্ষক প্রবন্ধপুস্তকে কাদম্বরী, কাব্যের উপেক্ষিতা, নববর্ষা, অভিজ্ঞানশকুন্তল, মেঘদূত, বাজেকথা, কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞানশকুন্তল, কেকাধ্বনি এসব প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তিনি প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এসব প্রবন্ধে তাঁর ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের প্রতিফলন ঘটেছে। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন –

> ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লির ঝংকারকে কেহ মধুর বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। ষড় ঋতুর মহাসঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়েছেন। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৬৮২)

সৌন্দর্যের আদর্শ বিচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবি জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা'র সঙ্গে কবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের 'পর্যাপ্তপুষ্প-স্তবকাবনম্র'র উহাহরণ 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন–

> 'ললিতলবঙ্গলতা'র পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক-
>
> আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
>
> পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবন ম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ (৩/৫৪, কুমারসম্ভব)
>
> ...এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে, সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৬৮২-৬৮৩)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি শৈশবে মেঘদূতের আবৃতি শুনে, এর ছন্দ ও গীতিমধুর উচ্চারণের দ্বারা ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর এই মুগ্ধতার প্রভাব সারা জীবনেই পড়েছিল। তাঁর 'মেঘদূত' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করলে এর গভীরতা অনুধাবন করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে শব্দ, উপমা, বাক্যাংশ, ভাব, ভাবনা, চিত্রকল্প ইত্যাদি যেসব ব্যবহার করেছেন তার আরও কিছু উদাহরণ দেয়া যাক।

মেঘদূতের প্রথম শ্লোকটি থেকে '*স্বাধিকারপ্রমত্ত*' এই অংশটুকু নিয়ে তিনি '*কালান্তর*' গ্রন্থে একটি প্রবন্ধের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। (ঠাকুর, ১৩৯৭: ৬৩২)

ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার তাৎপর্য ও গাম্ভীর্য বোঝাতে একই শ্লোকের পদাংশ 'কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্ত' উদ্ধৃত করেছেন। (ঠাকুর, ১৩৯৭: ৩০৯)

পূর্বমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকটি থেকে বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' এই অংশটুকু বিভিন্ন লেখায় ব্যবহার করেছেন। ছিন্নপত্রাবলির ৪৫নং চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ (ইন্দিরাদেবীকে লেখা) '*আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে*' উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া মহুয়া কাব্যের 'মুরতি' কবিতায় এই শ্লোকটির অনুরণন ঘটেছে। তিনি লিখেছেন, প্রথম আষাঢ়দিনে গুরুগুরু রবে... (মুরতি, মহুয়া)।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের প্রতি প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন তাঁর '*মানসী*' কাব্যের '*মেঘদূত*' কবিতার মধ্য দিয়ে। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মেঘদূত থেকে ভাব, ভাবনা, শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প ব্যবহার করে তিনি তাঁর 'মেঘদূত' রচনা করেছেন। কবির বর্ণনায়–

> কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
> কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
> লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
> বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
> রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
> সঘনসংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৩৩৫)

এখানে উভয় কবিতায়ই দেখা যাচ্ছে, 'প্রথম আষাঢ় দিনে' কিংবা 'আষাঢ়ের প্রথম দিবসে' অংশটুকুসহ কালিদাসের মেঘদূতেরই প্রভাব রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। এ উপন্যাসেও বহু জায়গায় আমরা কালিদাসের মেঘদূতের প্রসঙ্গ দেখতে পাই। তিনি শেষের কবিতার সংঘাত পর্বে লিখছেন–

> ঠিক সেই সময়টা অমিত ভাবছিল, আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর দূতটাই প্রশস্ত- তার মধ্যে 'ধূমজ্যোতি সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ' বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৪৬৮)

এখানে তিনি পূর্বমেঘের ৫ম শ্লোকের প্রথম পাদ ব্যবহার করেছেন।

এবার রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্যের বহুল আলোচিত স্বপ্ন কবিতাটি দেখা যাক। এ কবিতায় তিনি লিখছেন–

> দূরে বহু দূরে
> স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
> খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
> মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
> মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
> কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে...। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ১০৯)

এই কবিতায় উজ্জয়িনী, শিপ্রা, লীলাপদ্ম, কুন্দকলি, কুরুবক প্রভৃতির উল্লেখ কালিদাস এবং তাঁর কাব্যের নায়িকা যক্ষপ্রীয়ার কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। কালিদাসের মেঘেদূতের উত্তরভাগে একই চিত্র আমরা দেখতে পাই–

> হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।

চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ ত্বদুপগজং যত্র নীপং
বধূনাম্॥ (মেঘদূত, শ্লোক-২)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বজন্মের প্রিয়তমাকে মানসরথে খুঁজে ফেরেন উজ্জয়িনীপুরে এবং কালিদাসের নায়িকা যে প্রসাধন, যে বেশভূষা ব্যবহার করতেন তাই দিয়ে তিনিও তাঁর প্রিয়তমাকে সজ্জিত করে তুলেছেন এই কবিতায়। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চান, সেকালের কালিদাস একালে তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, কালিদাসের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তিনি জীবনভর লেখালেখির সাধনায় যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই কালিদাসকে কোথাও না কোথাও উল্লেখ করছেন, তাঁর সাহিত্যের উপকরণ ব্যবহার করেছেন। তারই প্রমাণ স্বরূপ কিছু নিদর্শন নিম্নে প্রদান করা হলো।

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যের 'বিচ্ছেদ' কবিতায় লিখছেন –

তার বিচ্ছেদের যাত্রা পথে
আনন্দে নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে;
নিত্যপুষ্প নিত্য চন্দ্রালোক
নিত্যই সে একা- সেই তো একান্ত বিরহী। (ঠাকুর, ১৩৯৬: ২৫৫)

'বিচ্ছেদ' কবিতার এই বর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের উত্তর মেঘের অলকাপুরীর বর্ণনার সাদৃশ্যও রয়েছে –

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা...
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥ (Kale, 1997: 112)

রবীন্দ্রনাথের *সানাই* কাব্যের 'যক্ষ' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতাটি রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের

দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যা পড়লেই অনুধাবণ করা যায়। তাঁর ভাষায় –

যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে
বর্ষাবাষ্প-ব্যাকুলিত দিগন্তে ইঙ্গিত-আমন্ত্রণে
গিরি হতে গিরিশীর্ষে, বন হতে বনে...
এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টীকা
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন-জ্বালা এই বিরহেই। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ১৭৯-৮০)

রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' প্রবন্ধটি মূলত কালিদাসের মেঘদূত কাব্য নিয়ে আলোচনা। তিনি এখানে লিখেছেন –

> মেঘদূতের মেঘ প্রতি বছর চিরনূতন চির পুরাতন হইয়া দেখা দেয়। প্রতি বছর যখনই আসে তখনই তাহার নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরানত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। মেঘ দেখিলে 'সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ' সুখী লোকেরও আনমনা ভাব হয় এই জন্যই। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৬৮৮-৮৯)

বর্ষা ঋতুর আবহে রচিত *মেঘদূত* কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই 'নববর্ষা' প্রবন্ধে আরও লিখেছেন :

> মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোন সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৬৯০)

রবীন্দ্রনাথের নাটক, উপন্যাস, চিঠিপত্র, গল্প, গান, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি প্রভৃতিতেও কালিদাসের কাব্য, নাটকের অনুরণন দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক 'চিরকুমারসভা'র ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে লিখেছেন :

> দেখবো আর কী। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক চোট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ হয়ে যাব, তবে রীতিমত সন্ন্যাসী হতে পারব। (ঠাকুর, ১৩৯৬: ৪৫১)

এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের পূর্ব মেঘের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে পদাংশ ব্যবহার করে ভাবের ব্যঞ্জনা আনয়ন করার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকের ৪র্থ অঙ্কের ২য় দৃশ্যে দেবদত্ত বলছেন – বলি ও শিখরিদশনা, পক্ববিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জলটল কিছু বেরোবে কি? (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৪৯১)

এখানে 'শিখরিদশনা পক্ববিম্বাধরোষ্ঠী' উপমাগুলো উত্তর মেঘের ২১তম শ্লোক 'তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্ববিম্বাধরোষ্ঠী' থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন :

> মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দীহৃদয়ের বিশ্ব ভ্রমণ। বর্ষাকালে সকল লোকেরই কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়, এমন কি প্রণয়িনী কাছে থাকলেও হয়, কবি নিজেই লিখেছেন-
> মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
> কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ (মেঘদূত, শ্লোক ৩)

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি এখানেও গভীর বিরহের দশা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ পূর্বমেঘের তৃতীয় শ্লোকটির দ্বিতীয় পাদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, চিঠিপত্রে সর্বত্র কালিদাসের প্রভাব সুগভীরভাবে ছড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থে কালিদাসের নাটকের যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন তা সাহিত্য সমালোচনার জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি 'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধে কালিদাসের নাটক, বিশেষত অভিজ্ঞান অভিজ্ঞানশকুন্তল সম্পর্কে যা লিখছেন তা প্রণিধানযোগ্য–

> শেক্সপীয়র মানবচরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে। তেমনি বলতে পারি, কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম, তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমর্যাদা হয়তো আছে, তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই; কিন্তু সখীপরিবৃতা অভিজ্ঞানশকুন্তল চিরকালের। তাকে দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু কোনো যুগের পাঠকই পারেন না। মানুষ উঠেছে জেগে; মানুষের অভ্যর্থনা সকল কালে ও সকল দেশেই সে পাবে। তাই বলছি, সাহিত্যের আসরে এই রূপসৃষ্টির আসন ধ্রুব। (ঠাকুর, ১৪১৪ : ৫১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের বেশ কিছু শ্লোক অনুবাদ করেছেন, এরমধ্যে ৫ম অঙ্কের প্রথমে নেপথ্যে হংসপদিকা সংগীতশালায় যে গানটি গেয়েছেন তিনি তার অনুবাদ এভাবে করেছেন -

> নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
> চূতমঞ্জরী চুমি'
> কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
> কেমনে ভুলিলে তুমি? (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৭২৯)

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কালের সাহিত্যরীতি অনুসারে বেশির ভাগ লেখক এবং সাহিত্য সমালোচকদের কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে বস্তুবিশেষ। অর্থাৎ Beauty is objective, it means beauty belongs to the object. কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী, মাঘ প্রভৃতি সংস্কৃত কবিদের কাছে সৌন্দর্যের ধারণা মূলত objective. কালিদাসের সৌন্দর্যের ধারণা তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে পাওয়া যায় -

> সর্বাস্ববস্থাসু রমনীয়ত্বম্ আকৃতি বিশেষণাম্। (Act VI, Sakantalam)

কিন্তু এ বিষয়ে আলংকারিক কুন্তকের একটি ভিন্নদৃষ্টি রয়েছে। তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিতম্' গ্রন্থে তিনি সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণরূপে Subjective অর্থাৎ ব্যক্তিক রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিকের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য কুন্তকের মতো Subjective রূপে গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে দার্শনিক Benebetto Croce অন্যতম। তাঁর মতে, Beauty is the expression, which is wholly and only mental. তাঁর Philosophy of Beauty হচ্ছে, An object is beautiful if perceiving it is accompanied by aesthetic pleasure. (Croce, www.britannica.com, 2023)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও সৌন্দর্য Subjective. কবি হিসাবে তিনি নিজেকে কুন্তক এবং ক্রোচের মতই Subjective মতে আস্থাশীল। *শ্যামলী* কাব্যের 'আমি' কবিতাটিতে এর প্রতিধ্বনি রয়েছে–

আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে। (ঠাকুর, ২০০৭: ২২৬)

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন কালিদাস থেকে আলাদা। তবুও তিনি কালিদাসের সাহিত্যের সৌন্দর্যের দ্বারা যে বিরাটভাবে মুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ব্যবহারিক জিনিসের নামকরণ প্রভৃতির মধ্যে। মূলত কালিদাসের সৌন্দর্য সৃষ্টি ও জীবন দর্শনের দ্বারা কবি আমৃত্যু অভিভূত ছিলেন। মেঘদূত নামের প্রবন্ধের মধ্যে তিনি যেভাবে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তা থেকে বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। তিনি লিখছেন -

> সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকু নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাশ, দেবগিরি, রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয় ঐ রেবা শিপ্রা-নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন পথ যদি থাকিত তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৭১৫)

কালিদাসের ব্যক্তি জীবন এবং কালিদাসের সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর মূল্যায়ন নির্ভর অসাধারণ সাহিত্য আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞানশকুন্তল' প্রবন্ধে লিখছেন –

> লৌকিক গল্প গুজবে কালিদাসের চরিত্র কলঙ্কে মাখানো। এই গল্পগুলি জনসাধারণের কর্তৃক কালিদাসের কাব্য সমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে কোন বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপরে আজ নির্ভর করা চলে না। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৭১৭)

এই প্রবন্ধেই তিনি লেখক কালিদাসের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিরও বিশ্লেষণ করেছেন। কালিদাসের কাব্যসৌন্দর্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন –

> মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম ও বৈরাগ্যের কাজ বলা হয়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতীর কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় না; তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন। (ঠাকুর, ১৩৯৩: ৭১৭)

কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি কবি হিসেবে কালিদাসের বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে। রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কালের দূরত্ব হাজার বছরেরও বেশি সময়ের। লিখেছেন দুজনে দুটি ভিন্ন ভাষায়। তবুও কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সম্পর্ক ছিল সুগভীর। লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় কবি কালিদাসের ভাব, ভাষা, ভাবনা, চিত্রকল্প, অলংকার, উপমা অনেক কিছুই নিজের লেখায় গ্রহণ করেছেন অকাতরে। শিক্ষা চিন্তায়ও কালিদাস রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যা তিনি তাঁর লেখায় স্বীকার করেছেন। প্রাচীন ভারতে মানুষের সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রে তপোবনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কালিদাসের সাহিত্যে এ সবের উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন কিংবা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে কালিদাসের কাব্যের তপোবনের ছায়া রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন -

> I have mentioned many times Tapavan as the model of Asrama. And this idea of Tapavan I have not got through the history analysis. I got it from the poet's poem. (ঠাকুর, ১৩৯৬: ৫৯২)

রবীন্দ্রনাথ *আত্মপরিচয়ে* যে কবির কথা বলতে চেয়েছেন, তিনি কবি কালিদাস ছাড়া আর কেউই নন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেকগুলি কবিতায় তাঁর প্রিয় কবি কালিদাসের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা নিবেদন করেছেন। সেসবের মধ্যে - কালিদাসের প্রতি, মানসলোক, ঋতুসংহার, কাব্য, কুমারসম্ভবগান, মেঘদূত প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, কালিদাসের কাব্য ঊনবিংশ শতকে ইংরেজি অনুবাদের কারণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ইউরোপ আমেরিকাসহ পৃথিবীর নানান ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হতে থাকে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে হোরেস হেম্যান উইলসন (H.H. Wilson, 1786-1860) প্রথম ইংরেজিতে মেঘদূতের

কাব্যানুবাদ করেন। জার্মান কবি শিলার মেঘদূতের প্রভাবে রচনা করেছিলেন Maria Stuart কাব্য। আরও অনেকেই কালিদাসের নাটক ও কাব্য অনুবাদ করেছেন সে সময়ে।

কালিদাসের কবি প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণবপদাবলির কাল থেকে কবি লেখকগণকে যুগে যুগে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে আসছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের মধ্যেও কালিদাসের আকর্ষণ, প্রভাব পড়েছে অপরিসীম। বিশেষভাবে ত্রিশের দশকের আধুনিক কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনূদিত কালিদাসের মেঘদূত কাব্য বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫) কাব্যে অনুবাদ করেছেন কালিদাসের মেঘদূত। কবি জাহেদা খানম (১৯২৩-২০০৮) তাঁর শেষ জীবনে এসে ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষা শিখে অনুবাদ করেছেন কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যটি যা বর্তমানে সাহিত্যরসিক সুধীমহলে গৃহীত ও প্রশংসিত হচ্ছে। অধ্যাপক সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী অনুবাদ করেছেন 'মেঘদূত ও সৌদামিনী', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' প্রভৃতি কালিদাসের গ্রন্থ। বর্তমান সময়েও কালিদাস চর্চার এ ধারা, ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে হলেও, বাংলাদেশে এবং বাংলা সাহিত্যে প্রবহমান রয়েছে।

উপসংহার

চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন এবং বৈষ্ণব পদাবলীকে প্রথম সার্থক কবিতা ধরা হয়ে থাকে। চর্যাপদের ভাব ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। চর্যাপদকে বাদ দিলে পরবর্তী পর্বের বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্যের মহাকবি বাল্মীকি, ব্যাসদেব, কালিদাস, জয়দেব প্রমুখ কবিদের সুগভীর প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে চর্যাপদ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের কবি লেখকগণের কাছে কালিদাস ছিলেন সবচেয়ে বেশি আদরণীয় এবং অনুসরণীয়। তাঁর কাব্যের আবেদন বাংলা সাহিত্যে তাই চিরন্তন রূপ লাভ করেছে।

সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধের উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের একজন মহান কবি কালিদাসের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান কবি, সাহিত্যিকগণ যুগে যুগে প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা ভালোভাবে বুঝতে হলে তাই কালিদাসের সাহিত্য সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রাচীন ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের একজন লেখক হয়েও মহাকবি কালিদাস বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কবি-লেখকগণের হৃদয় আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিরাজ করছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সেন, সুকুমার [সংকলিত], (২০০৩)। বৈষ্ণব পদাবলী। সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি

২. Kale, M.R [Translated], 1997. The Meghaduta of Kalidasa. Motilal Banarsidass Publishers, Delhi.

৩. সিদ্দিকী, রতন [সম্পাদিত], (১৯৯৭)। বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহঃ সারদামঙ্গল। বিশ্বসাহিত্যভবন, ঢাকা

৪. Kale, M.R [Translated], 1997. The Meghaduta of Kalidasa. Motilal Banarsidass Publishers, Delhi

৫. সিদ্দিকী, রতন [সম্পাদিত], (১৯৯৭)। বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহঃপ্রেম প্রবাহিনী। বিশ্বসাহিত্যভবন, ঢাকা

৬. গুপ্ত, ড. ক্ষেত্র [সম্পা.] (২০০৪)। *মধুসূদন রচনাবলি*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, (২০০১)। *বঙ্কিম রচনাবলি*, কপালকুণ্ডলা, তুলি কলম, কলকাতা

৮. বসু, বুদ্ধদেব [অনূদিত], (২০০০)। *কালিদাসের মেঘদূত*, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (খন্ড-৯), (১৩৯৬)। রবীন্দ্ররচনাবলিঃ পিতৃদেব। সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী

১০. ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ (১৯৬২)। *আত্মজীবনী*, বিশ্বভারতী

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (খণ্ড-৩) (১৩৯৩)। *রবীন্দ্ররচনাবলি*, বিচিত্র প্রবন্ধ

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (খণ্ড-১২) (১৩৯৭)। *রবীন্দ্ররচনাবলি*

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (খণ্ড-২১) (১৩৯৩)। *রবীন্দ্ররচনাবলি*

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১ম খণ্ড) (১৩৯৩)। *রবীন্দ্ররচনাবলি*

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ(৫ম খণ্ড) (১৩৯৩)। *রবীন্দ্ররচনাবলি*

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ(৪র্থ খণ্ড) (১৩৯৩)। *রবীন্দ্ররচনাবলি*

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ(৮ম খণ্ড) (১৩৯৬)। *রবীন্দ্ররচনাবলি*

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১২ খণ্ড), (১৩৯৩)। *রবীন্দ্ররচনাবলি*

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪১৪)। *সাহিত্যের স্বরূপ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা

২০. https://www.britannica.com/topic/Benedetto-Croce-on-aesthetics-1990551

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০০৭)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে শ্রেষ্ঠ কবিতাঃ *আমি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা